# বিলয়

## মশিউল আলম

যে-লেখাটি নিচে পত্রস্থ হচ্ছে তা আমার রচনা নয়। লেখাটি আমার হস্তগত হয়েছে আমাদের ক্রাইম রিপোর্টার সুপন রায়ের মারফতে। গত আগস্ট মাসে তিনি লেখাটি সংগ্রহ করেছেন ঢাকার তেজগাঁও থানা থেকে। সে-মাসের ২০ তারিখে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে দেড় রুমের একটি ভাড়া বাসায় পুলিশকে ঢুকতে হয় দরজা ভেঙে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাড়িওয়ালা মাসের ভাড়া নিতে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কি করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সংশয়ে পড়েন। খারাপ কিছু-একটা ঘটেছে আশঙ্কা করে তিনি পুলিশ ডাকেন। পুলিশ দরজায় তালা দেখতে না পেয়ে ভেতরে লোক আছে মনে করে প্রথমে ডাকাডাকি করে। তারপর ধাক্কাধাক্কি শুরু করে তারা, তারপর দরজা ভাঙতে বাধ্য হয়। ভেতরে ঢুকে তারা কাউকে দেখতে পায় না। পুলিশ-বাড়িওয়ালা বিস্মিত হয়ে বাসার সবকটি জানালা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সবই অক্ষত দেখতে পায়। ভেতর থেকে কোনো মানুষের বেরিয়ে যাবার মতো কোনো পথ বা ছিদ্র কোথাও ছিল না।

বাসাটিতে ভাড়া থাকতেন, বাড়িওয়ালার সাক্ষ্য অনুসারে, এক যুবদম্পতি। যুবকের নাম নেয়ামুল কবীর, একটি গার্মেন্ট কম্পানিতে স্বল্প বেতনে চাকরি করতেন। তার স্ত্রী কিছু করতেন না, সারাদিন ঘরে বসে কাটাতেন। কালেভদ্রেও তিনি ঘরের বাইরে বেরুতেন না। প্রতিবেশী ভাড়াটে বা বাড়িওয়ালার পরিবারের সঙ্গে তাদের কোনো মেলামেশা ছিল না। পাশের ভাড়াটেরা কখনো তাদের বাসা থেকে কোনো শব্দ-টব্দ—যেমন তৈজসপত্রের, টেলিভিশন বা টেপরেকর্ডারের, বা তাদের কণ্ঠের—শুনেছে বলে স্মরণ করতে পারে না। তাঁরা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে, একান্ত নিভৃতে নিঃশব্দে বসবাস করতেন।

পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে, বাসার একমাত্র দরজাটি ভেতর থেকে দুটি ছিটকিনি দ্বারা বন্ধ ছিল। দুটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ কিভাবে কোন পথে বাসা থেকে বেরিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তা তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় নি। খবরের কাগজগুলোতে খবর ছাপা হয়েছে, 'রহস্যজনকভাবে দম্পতি উধাও'। সাংবাদিকরা পুলিশ ও বাড়িওয়ালার কাছে তাদের অনুমানের কথা জানতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের বলা হয়েছে, এব্যাপারে কোনো আন্দাজ বা অনুমানই তাদের মাথায় আসে নি।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্র থেকে জানা গেছে নিরুদ্দেশ নেয়ামুল কবীরের স্থায়ী নিবাস দিনাজপুর শহর, পিতা মৃত আক্কাসুর রহমান। তার বিরুদ্ধে বাড়িওয়ালার কোনো অভিযোগ ছিল না, তিনি কোনো মামলা করেন নি বলে পুলিশ বিষয়টি নিয়ে আর কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল দেখায় নি। সুপন রায় দুয়েকবার ভেবেছেন দিনাজপুর গিয়ে খোজঁখবর করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। বিষয়টা আগাগোড়াই এমন অবিশ্বাস্য আর উদ্ভট যে ফলোআপ করার মতো সামান্যতম ক্লু-ও কোথাও ছিল না। সুতরাং ব্যাপারটা সেখানেই চুকেবুকে গিয়েছে।

নিচের লেখাটি, পুলিশ এবং সুপন রায়ের ধারণা, সেই নেয়ামুল কবীরের। সুপন সাহিত্যরসিক। পুলিশের কাছ থেকে লেখাটির একটি ফটোকপি তিনি নিয়ে আসেন, পড়েন। পড়ে বেশ আলোড়িত হন এবং সেই আলোড়ন ভাগাভাগি করার জন্যে লেখাটি আমাকে পড়তে দেন। আমি লেখাটি কয়েকবার পড়ি, বেশ অভিভূত হই এবং লেখক সম্পর্কে সুপনের কাছে জানতে চাই। (আমি তখনও জানি না লেখাটি তিনি কোথায় পেয়েছেন।) তিনি আমাকে যা জানান তা উপরে বলেছি। তার বেশি আর কিছু জানা যায় নি। আমরা দুজনে স্থির করি লেখাটি প্রথম আলোর শুক্রবারের সাময়িকীতে ছাপানোর জন্য সাহিত্য সম্পাদককে দেব। আমরা সাহিত্য সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফকে লেখাটি পড়ে দেখার অনুরোধ জানাই । তিনি প্রথমে লেখাটির ওপর হালকাভাবে চোখ বুলাতে আরম্ভ করেন, দেখতে দেখতে মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং এক নিঃশ্বাসে লেখাটি পড়ে শেষ করে আমাদের দিকে চেয়ে উদগ্রীব হয়ে জানতে চান লেখাটি কে লিখেছে। সুপন তাঁকে বিস্তারিত বলেন। আমরা জানতে চাই প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করে লেখাটি ছাপানো যায় কি না। সাজ্জাদ শরিফ বলেন কোনো পরিমার্জনার দরকার নেই, লেখাটি অবিকৃতই ছাপার যোগ্য।

অতএব নেয়ামুল কবীরের লেখাটি হুবহু ছাপা হচ্ছে। শুধু লেখাটির শিরোনাম আমার দেওয়া।

আমার বয়স ২৮। আমার স্ত্রীর ২২। অথবা ২৩। বা ২১; আমি ঠিক জানি না। মনে হয় সে নিজেও নিশ্চিত জানে না। সে কখনো ঠিক করে বলে নি। অবশ্য ওর মিথ্যে বয়সটা ২১, মানে এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেটের। তা যাই হোক, বয়স কোনো ফ্যাক্টর না। আমি এখন, আমার এখন বলতে ইচ্ছে করছে আমাদের সম্পর্কের কথা। না, আমি বোধ হয় বলতে চাই সে কেমন মানুষ (ছিল)। ছিল, এখন নেই। একটু আগে সে মারা গেছে। একটু আগে মানে কতো আগে তা বলতে পারব না, কারণ সে যখন মরে গেছে তখন আমি ঘড়ি দেখি নি, আর এখন কটা বাজে তাও আমি জানি না। তবে কোনো ভুল নেই, আমি নিশ্চিত, এতক্ষণে সে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মানুষ মরে যাওয়ার পরে আমরা বলাবলি করি সে কেমন মানুষ ছিল। বলি, আহা লোকটা বড় ভালোমানুষ ছিল। আমার স্ত্রীর সম্পর্কে আমি তা বলব না। তার সঙ্গে দুই বছর বাস করে আমি বুঝতে পারি নি তাকে। তাই বলে তার সঙ্গে আমার বনিবনা ছিল না তা কিন্তু নয়। একসঙ্গে থাকলে একটু-আধটু বনিবনা তো হয়ই। মনোমালিন্যও হয়। আমাদের মধ্যে দুরকমই ছিল। কিন্তু সেটাও বড় কোনো ব্যাপার নয়। আলাদা করে দেখার বিষয় নয়। আর এখন তো সেসব ভাববার মতো বিষয়ই নয়। কারণ সে মারা গেছে। আর আমার মনে হচ্ছে, আমিও মারা যাচ্ছি।

পরশু সকালে তার জ্বর আসে। দুপুর হতে হতে জ্বর বেড়ে ওঠে একশ তিন ডিগ্রিতে। সে খুশি হয়ে ওঠে কেননা সে সবসময় মৃত্যুর কথা বলে, মরতে চায়। এমনিতে সে সবসময় মনমরা থাকে। অসুখবিসুখ করলে খুশি হয়ে ওঠে, ভাবে এইবার মরার সুযোগ এল। কিন্তু গত দুবছরে বেশ কয়েকবার ভালো রকম জ্বরে ভুগলেও মরবার সুযোগ সে পায় নি। এবার, গত মঙ্গলবার দুপুরে, তার জ্বর একশ তিন ডিগ্রি পেরিয়ে আরো উপরের দিকে চড়তে থাকলে সে খুশি হয়ে আমাকে বলে, 'এবার আর মিস নেই। এবার আমি মরবই।' আমি তাকে আদর করে বলি ,' না তুমি মরবে না। কেন মরতে চাও তুমি?' আমি তার কপালে জলপট্টি দিচ্ছিলাম আর সে হাসছিল। হাসিটা বড় ম্লান দেখাচ্ছিল। বরাবরই সে ম্লান, নিস্প্রভ ধরনের মেয়ে। সে খুব ফর্সা, আর তখন তার মুখ, গাল, কপাল দেখাচ্ছিল সাদা কাগজের মতো। চোখ দুটো গরুর চোখের মতো নিরীহ। হ্যাঁ, আমি তার কপালে জলপট্টি দিচ্ছিলাম আর সে হাসছিল আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে। আগ্রহ নিয়ে, পার্থিব মানুষের মতো কৌতূহলভরা চোখে আমার চোখের দিকে সে কখনো তাকায় নি। কিন্তু সে যে অভিমানী বা উন্নাসিক, তা-ও নয়। সে যেন কেমন, আমি বুঝতে পারি না।

কপালে জলপট্টি দিয়েও বশ মানছিল না তার জ্বর। সাদা মুখ পুড়ে তামাটে হয়ে যাচ্ছিল। আমি দোকান থেকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কিনে আনলাম। সে বলল, খাব না। আমি খুব সাধাসাধি করলাম, তবুও সে ট্যাবলেট খেল না। আমি খাইয়ে দিতে চাইলাম, সে মুখ খুলল না। আমি বললাম, ছেলেমানুষের মতো জেদ কোরো না। সে শুধু ম্লানভাবে হাসল। তার মুখমণ্ডল, সুন্দর সকরুণ মুখমণ্ডলটা পুড়ে পুড়ে তামা হয়ে যাচ্ছিল।

এভাবে দিনটা গেল। রাতে আমি আলু ভর্তা করে ডিম ভেজে তাকে ভাত খেতে দিলাম। সে খাবার ছুঁয়েও দেখল না। শুধু ম্লান, মরাহাসি হেসে বলল, খাব না। আমি কাকুতি-মিনতি করলাম, ছোট বোনের মতো আদর করলাম, লক্ষ্মী বললাম, সোনা বললাম। সে শব্দ করে হাসল। কিন্তু খাবার স্পর্শ করল না। রাতে ঘুমাল না। ঘুমাতে পারল না কারণ তার জ্বর আরো বাড়ছিল। দাঁতে দাঁত কামড়ে সে পড়ে রইল সারারাত।

পরদিন তার জ্বর বেড়ে উঠল ১০৪ ডিগ্রিতে। আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে আনলাম। দেখেটেখে সে ১৪টা কট্রিম ট্যাবলেট, দিনে তিনটা করে নাপা আর হিসটাসিন ট্যাবলেট লিখে দিয়ে গেল। আমি ওষুধগুলো কিনে আনলাম। সে স্পর্শ করল না। দুপুর গড়িয়ে গেলে বলল, ভাত খাব। আমি তাকে ভাত খেতে দিলাম। সে একটুখানি খেল, বেশিটাই খেল না। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ওষুধ খেতে বললাম। সে ম্লান হেসে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। ওষুধ খেল না। তার জ্বর আরো বাড়তে লাগল। বিকেলে কিছু ফলমূল কিনে আনলাম। গ্লুকোজ, ডাব নিয়ে এলাম। সে কিছুই মুখে তুলল না। আমার মনে হতে লাগল, এবার বুঝি সে সত্যি সত্যিই মরে যাচ্ছে।

ওই দিনটাও চলে গেল ওভাবেই। রাতে তার কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিলাম, যেন তপ্ত কড়াইয়ে হাত দিয়েছি। তাড়াতাড়ি থার্মোমিটার ধুয়ে এনে জোর করে তার মুখে ঢুকিয়ে দিলাম (কেননা সে আর জ্বর মাপতে দিচ্ছিল না)। সে বলল, কামড়ে দিলাম।

খবরদার! পাগলামী করো না। অ্যালার্ট হয়ে বললাম।

কী হবে কামড়ে দিলে?

কাচ তো, ভেঙে যাবে। জিভটিভ কেটে যাবে, পারদ বেরিয়ে চলে যাবে পেটের মধ্যে।

তাহলে মরে যাব?

ভরসা হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টান দিয়ে ওর মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে নিলাম। এক মিনিটও হয় নি, দেখলাম এরই মধ্যে পারদ ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের দাগ ছুঁয়েছে। আমি থ হয়ে বসে রইলাম। সে ছাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

পরদিন সকালে জ্বর এল আমার। মানে আজ সকালে। ভাবলাম খুব ছোঁয়াচে আর বেপরোয়া ধরনের এক ভাইরাল ফিভার এটা। কট্রিম আর প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেলাম একসঙ্গে দুই ডোজ করে। কিন্তু জ্বর বশ মানল না। দুপুরে রান্না করে ভাত খেলাম, ট্যাবলেটগুলো খেলাম। জ্বর কমল না। বউয়ের পাশে শুয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, তার জ্বর, এবার আমারও জ্বর এল, এবার যদি তার মধ্যে সহমর্মিতার বোধ জাগে, একাকিত্বটা দূর হয়ে যায়। বিপদগ্রস্ত পরিব্রাজকদের মধ্যে যেমন হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত লোকজনদের মধ্যে যেমনটি হয়ে থাকে। কিন্তু দেখতে পেলাম সে নির্বিকার চেয়ে আছে সাদা, শূন্য ছাদের দিকে। আমি সস্নেহে তার কপালে একটা হাত রাখলাম। আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে। তার জ্বর নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

বিকেল থেকে সে খুব কথা বলতে শুরু করল। ছাদের দিকে তাকিয়ে, পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে চেয়ে আপন মনে অনর্গল বকে চলল। তারপর ছড়া কাটতে আরম্ভ করল। একটার পর একটা ছড়া বলে চলল। আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে। ঢাকঢোল ঝাঝর বাজে। বাজতে বাজতে চলল ঢুলী। ঢুলী গেল কমলাফুলি। তারপর হঠাৎ থেমে আবার গোড়া থেকে শুরু। তারপর, আমাদের ছোটনদী চলে বাঁকে বাঁকে। বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি— । মাঝখানে সে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে শুরু করে। তারপর আবার ছড়া— ওই দ্যাখা যায় তালগাছ ওই আমাদের গাঁ। ওইখানেতে বাস করে কানাবগির ছা— । আমি নরম, সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে বলি, বাড়ি যাবে? বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে? তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বকে চলল আপন মনে। আমার কোনো কথাই সে আর শুনল না।

রাত দুটোর দিকে সে চুপ মেরে গেল। ক্লান্ত হয়ে চোখদুটো তার বুঁজে এল। আর খুলল না। আমি একটু স্বস্তি পেলাম, ভাবলাম ঘুমাল। একটু পরে তার কপালে হাত রেখে দেখলাম ঠাণ্ডা, ভাবলাম তার জ্বর পড়ে গেছে, আর আমার বেড়েছে। আমি তাকে ডাকলাম। সে সাড়া দিল না। ভাবলাম ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। বড় কষ্ট পাচ্ছিল বেচারি।

এদিকে আমার জ্বর চড়তে লাগল। মেপে দেখলাম ১০৩ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ছটফট করতে লাগলাম। তাকে মৃদু স্বরে ডাকলাম একবার। তারপরেই মনে হল, থাক, কেন ডাকছি। বেচারি ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছিল। ভীষণ একা আর অসহায় বোধ হচ্ছিল। আমার মার কথা মনে পড়ছিল। জ্বরের ঘোরে এসময় আবার তার কপালে হাত রাখলাম। ঠাণ্ডা হিম। মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিলাম। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। এবার ঝাঁকুনি দিলাম জোরে। তার মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে বালিশ থেকে ঢলে পড়ে গেল।

ঘরের মঝেতে ইঁদু আর আরশোলার দল ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। তারা টের পেয়ে গেছে। তাদের মারবার জন্যে আমরা কাওরানবাজার থেকে যন্ত্র আর বিষ কিনে এনেছিলাম।

এখন রাত চারটা। সে আমার পাশে মৃত শুয়ে আছে। ইচ্ছে হলেই আমি তার কপালে হাত রাখতে পারছি। বরফের মতো ঠাণ্ডা তার কপাল। কিন্তু বারবার এই হিম মৃত্যুকে ছুঁয়ে কী লাভ! থাক, সে যেভাবে রয়েছে, সেভাবে শুয়ে থাক। আমি তার পাশে শুয়ে শুয়ে কিছু ভাবার চেষ্টা করি। কাল তো ওকে নিয়ে যাওয়া হবে। রেখে আসতে হবে কবরে। কিন্তু তারপর? তারপর আমি কী করব একা একা? তারপর আর কোনোদিন, কক্ষনো, কষ্মিনকালেও তাকে আর দেখতে পাব না? আমার জ্বর বাড়ছে। ১০৪ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। মনে হয় আমিও মারা যাচ্ছি। কিন্তু আমি কখনো মরতে চাই নি। আর দশজন সহজ-সাধারণ লোকের মতো আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছি।

কিন্তু ও সবসময় মৃত্যুর কথা বলত। বিয়ের রাতেই বলেছিল, আমি যদি মরে যাই? আমি ভেবেছিলাম, সে যাচাই করে দেখতে চাইছে আমি তাকে কতটা ভালোবাসি। কিন্তু পরে দেখেছি, দেখেশুনে বুজতে পেরেছি, আমার ভালোবাসা ও চায় নি। ও আসলে কিছুই চায় নি। কিছুরই দরকার ছিল না ওর। এত অল্প বয়সে জগতের সমস্ত দরকার ওর ফুরিয়ে গিয়েছিল কেমন করে? নাকি কোনো দরকারবোধ নিয়েই সে আসে নি পৃথিবীতে? অথবা পৃথিবীতে এসে কোনো কিছুর জন্যেই তার কোনো আকাঙ্খা জাগে নি?

আমার জ্বর বাড়ছে চড়চড় করে। আমি একটা অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হচ্ছি। অগ্নিপিণ্ড নিজে উত্তপ্ত, কিন্তু তার শীত লাগে, আমার মতো। ভীষণ শীত করছে আমার। একটা কাঁথা চাই। একটা লেপ দরকার। কিন্তু এই ভাদ্রমাসে লেপ-কাঁথা পাব কোথায়? ওগুলো ইঁদুরে কেটেছে। ওই যে ইঁদুরের দল, ছোট ছোট ফুর্তিবাজ দুষ্টু ইঁদুরের দল ছুটোছুটি করছে ঘরময়। ওরা টের পেয়ে গেছে। ওরা দল বেঁধে টুকরো টুকরো করে খাবে আমাদের। আমাদের শরীর পচে যাবে। কেউ টের পাবে না এখানে, এই শহরের এক অন্ধকার গলিতে একটি ছোট্ট ঘরে আমরা মরে পড়ে আছি। আমর ফুলে উঠব, ফেঁপে উঠব, দুর্গন্ধ ছড়াব। তবু কেউ আমাদের ডাকতে আসবে না। কেউ আসবে না আমাদের দরজায় টোকা দিতে। আমরা পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে গেলে, মাস ফুরোলে বাড়িওয়ালা আসবে বাড়িভাড়া নিতে। কিন্তু আমাদের পাবে না। আমরা শেষ। আমরা নিঃশেষিত।

কিন্তু রুনু কোথায়? কই গেল মেয়েটি? না, সে যাবে কিভাবে? কে তাকে নিয়ে গেল? জিরো ওয়াটের নীল বাল্ব জ্বলছে ঘরে। আমি তাকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম তো। তার পাশেই, প্রায় গায়েগায়ে শুয়েছিলাম। এখনো একই জায়গায় শুয়ে আছি। কিন্তু পাশে রুনু নেই। নিঃশব্দে কে তাকে তুলে নিয়ে গেল? নাহ্! কে আসবে? কেমন করে আসবে? ভিতর থেকে দরজা বন্ধ যে। আজ সারাদিন আমরা দরজা খুলি নি। তাহলে? রুনু কি মরে নি তাহলে? চুপ করে শুয়ে ছিল? এক ফাঁকে নিঃশব্দে উঠে গেছে? এমন নিঃশব্দে যে নাগালের মধ্যে থেকেও টের পাই নি আমি? হতে পারে নাকি? অসম্ভব! অসম্ভব!

আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে? আমি জ্বরের ঘোরে দিশা হারিয়ে ফেলেছি? অন্ধ হয়ে যাচ্ছি? তা কী করে হবে? নীল আলোয় আমি তো সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। বিছানার ভাঁজ পর্যন্তস্ত তাহলে রুনু গেল কোথায়? বাথরুমে? তাহলে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হবে না? বাতি জ্বলবে না? পানির শব্দ পাব না?..যাক গে যেখানে ইচ্ছে! আমার আর কোনো উৎসাহ নেই, শক্তি নেই, কৌতূহল নেই। মারা যাচ্ছি আমি। নিভে যাচ্ছি। নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। আমি আর নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার হাত নেই, পা নেই, বুক-পেট-পাঁজর কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। আমি ভীষণ ছোট হয়ে গেছি, একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেছি। বিন্দু কি নিজেকে দেখতে পায়?

ও হো! আমি তো আমাদের সম্পর্কের কথা বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম রুনু কেমন মেয়ে ছিল, আমি কেমন ছেলে ছিলাম, আর আমাদের সম্পর্কটা কেমন ছিল। হাঃ হাঃ কী হাস্যকর! মানুষ তার নিজের গল্প অন্যদের শোনাতে চায়! কী হাস্যকর যে মানুষেরা একে অপরকে গল্প শোনায়! কী হাস্যকর যে মানুষেরা কথা বলে, কাজ করে, পরস্পর মেলামেশা করে। কী নিষ্ফল, কী অর্থহীন, কী উদ্ভট!

আগডুম বাগডুম
ঘোড়াডুম হাতিডুম
গরুডুম মোষডুম
হাঁসডুম মুরগিডুম
মুজিবডুম জিয়াডুম
রুনুডুম আমিডুম..........

# ডুম্‌স্‌ ডে !